কারখানার মালিক হয় মন্ত্রী-মেয়র, শ্রমিক ভাঙে ইট!

শহীদুল ইসলাম সবুজ

গার্মেন্ট কারখানায় শ্রমিকদের কাজের পরিবেশই এমন যে সেখানে বেশিদিন একজনের পক্ষে কাজে যুক্ত থাকা সম্ভব হয় না। অসুস্থ, নির্যাতিত, প্রতারিত হয়ে কতো শ্রমিক কতোভাবে আরও জটিল অনিশ্চয়তায় নিক্ষিপ্ত হচ্ছেন তার কোনো পরিসংখ্যান নেই। এরকমই একজন শ্রমিক খালেদা। তাঁর জীবনের কাহিনী থেকে আরও অসংখ্য শ্রমিকের জীবনের সন্ধান পাওয়া যাবে।

একমনে শিম কুচি কুচি করে কাটছেন খালেদা আক্তার। একটু আলুও কেটে রেখেছেন আরেকটা বাটিতে। একটা প্লাস্টিকের গামলায় কিছু পাঁচমিশালি শাক, যা তিনি তুলে এনেছেন ইট টোকাতে গিয়ে। পরনের কামিজের দুই হাতার ওপরের কাঁধের অংশ লম্বালম্বি ছেঁড়া। দুই কাঁখের অংশও থেঁতলে যাওয়া ছেঁড়া। হালকা-পাতলা গড়নের শরীরে পরিধেয় কাপড়ের রং পালটে গেছে পোড়া ইটের লাল ধুলা আর বালুতে। কাঁধের আর কাঁখের কাপড় ছিঁড়েছে টোকানো ইটের বস্তা টানতে টানতে।

দরজার সামনে থেকে ডাক দিতেই সাড়া দিলেন। জীবনসঙ্গী বাবুকে বললেন–দেখো কে এসেছে! হাতের কাজ বন্ধ রেখে দুজনেই বেরিয়ে এসে হাত ধরে ঘরের ভেতরে নিয়ে গেলেন। তাঁদের ঘুমানোর চৌকিটাতে বসতে দিলেন। চারদিকে দেয়ালঘেরা ওপরে টিনের চালের ঘরটিতে ঢুকেই আঁতকে উঠবে যে কেউ। তিন হাজার টাকা মাসিক ভাড়ায় ঘরটির দেয়ালের দুই পাশেই দুই-আড়াই ইঞ্চি পরিমাণে মারাত্মক ফাটল! ভারি বৃষ্টি বা মাঝারি ধরনের ঝোড়ো হাওয়ায় ঘরটি ভেঙে পড়ার আশঙ্কা রয়েছে। অবশ্য প্রায় সিঙ্গল যে চৌকিটায় তাঁরা ঘুমান সেটা ছাড়া তাঁদের ঘরে তেমন কোন আসবাবপত্রও চোখে পড়েনি। চৌকির পাশেই একটা পুরনো ড্রামের ওপর সদ্যোগত শীতে ব্যবহার করা প্রায় ছিন্ন কাঁথা-কম্বল রাখা। ড্রাম লাগোয়া একটি আলনায় কাপড়চোপড়ের পাশাপাশি নিচের অংশে ঠাঁই পেয়েছে পানির কলসিটাও। সামনের দেয়ালের সাথে লাগানো খানাটুলিটাতে (মিটসেফ) দুই-তিনটা হাঁড়ি-পাতিল থালা-মগের পাশেই পলিথিনে মুড়িয়ে রেখেছেন গার্মেন্টে চাকরিকালীন কিছু কাগজপত্র ও হাজিরা কার্ড। হাঁড়ি-পাতিলের কয়েকটি আলনার সামনে ফ্লোরেই থাকে। মাথার ওপরে টিনের চালের সাথে পাটের রশি দিয়ে ঝোলানো তক্তার ওপরে রাখা ব্যাগ আর দু-একটি কাপড়। কক্ষটির দক্ষিণ-পূর্ব কর্নারে আলনা আর খানাটুলির মাঝখানের জায়গাটুকু লালসালুতে ঘেরা। সেখানে ভান্ডারি মতাবলম্বীদের কোন এক দরগার ২০ বাই ১৬ সাইজের রঙিন ছবি। ছবির সামনে মোমবাতি আর ধূপ জ্বালানোর জন্য ইঞ্চি দশেক জায়গা। প্রতি তিন মাসে ছোট্ট একটা জলসা ও শিরনি হয় লালসালু আর ছবিকে কেন্দ্র করে। কাছে গেলেই আগরবাতির ঘ্রাণ নাকে লাগে।

প্রায় দুই বছর পর দেখা। অনেক কথা জমা হয়ে ছিল। টানা তিন মাস খোঁজার পর তোমার দেখা পেলাম–একথা শুনেই খালেদা বলেন, 'আমারে খুঁইজা আর কী অইব, আমি তো সংগডনের জইন্যও কিছু করবার পারি নাই, আর নিজের অবস্থা তো এহন আরও খারাপ।' কুশলাদি বিনিময়ের সাথে সাথে এগোতে থাকে আলাপ। দুপুর ২টা পার হয়েছে। এত দেরিতে দুপুরে রান্না করে খাবেন কখন জানতে চাইলে বলেন, এটা তাঁর রাতের রান্নার আয়োজন। কারণ দুপুরে তাঁরা রান্নার সুযোগ পান না। প্রতিদিন এক বেলা রান্নার সুযোগ পান, সেটা সন্ধ্যার পরে। এক বেলার রান্নাই তাঁরা পরের দিন দুপুর পর্যন্ত খান। রাজধানীর গোড়ান, মেরাদিয়ার যে বাড়িতে তিনি থাকেন ওই বাড়িতে প্রতি চারটি পরিবারের জন্য একটি গ্যাসের চুলা রয়েছে।

৩৫ বছর বয়সী খালেদা আট বছর বয়স থেকেই গার্মেন্টে চাকরি করেছেন, খালেদার ভাষায়, 'আমি হাপপেন্ট পিন্দনের সময় থাইকাই গার্মেন্টে চাকরি করি।' মালিবাগ, মগবাজার, বাংলামোটর, রামপুরা অঞ্চলের ৮-৯টি গার্মেন্টে চাকরি করেছেন গত দুই যুগেরও বেশি সময় ধরে। চাকরির শুরুর মাসের বেতন ছিল ৩০০ টাকা। মাসের মাঝামাঝি সময়ে গার্মেন্টে ঢোকার কারণে প্রথম মাসে বেতন পেয়েছিলেন ১৫০ টাকা। সর্বশেষ ২০১৭ সালে সুইং অপারেটর হিসেবে চাকরি করেন মালিবাগ চৌধুরীপাড়ার একটি গার্মেন্টে। তখন তাঁর কার্ড নম্বর ছিল ৩৪৯। ওই গার্মেন্টে তাঁর বেতন ধরা হয়েছিল ৫৫০০ টাকা। মাস শেষে ওভারটাইমসহ খালেদার বেতন পাওয়ার কথা ছিল ৭০০০ টাকার কাছাকাছি। কিন্তু মালিকপক্ষ রমজান মাসে ঈদের কয়েক দিন আগে খালেদাসহ আরও সাড়ে তিন শতাধিক শ্রমিকের বেতন-ভাতা পরিশোধ না করেই পালিয়ে যায়।

প্রতিদিন এক বেলা রান্নার সুযোগ পান, সেটা সন্ধ্যার পরে। এক বেলার রান্নাই তাঁরা পরের দিন দুপুর পর্যন্ত খান। রাজধানীর গোড়ান, মেরাদিয়ার যে বাড়িতে তিনি থাকেন ওই বাড়িতে প্রতি চারটি পরিবারের জন্য একটি গ্যাসের চুলা রয়েছে।

খালেদা বলতে থাকেন, 'যেই গার্মেন্ট মালিকরা আমাদের বেতন না দিয়া পালায়, ৫ ঘণ্টা ওভারটাইম খাডাইয়া ৩ ঘণ্টার হিসাবই করে না, ওভারটাইমের মজুরি যেহানে ডাবল হওয়ার কতা, সেখানে দেয় মাত্র ৩৫% থাইকা সর্বোচ্চ ৪৫% টাকা, সেই গার্মেন্টেই আমরা কাম করি সকাল ৮টা থেকে শুরু কইরা রাত ১০-১১টা, আবার শিপমেনের (শিপমেন্ট) নামে মাঝে মাঝেই হারা রাইত।' এর মধ্যে কাজভেদে একটানা ৮ ঘণ্টা বসে বা দাঁড়িয়ে কাজ করতে হয় তাঁদের। সকাল ৮টায় শুরু করে দুপুর ১টা পর্যন্ত টানা ৫ ঘণ্টা কাজ। আবার ১টা থেকে ২টা লাঞ্চ বিরতির পরে রাত ১০টা পর্যন্ত টানা ৮ ঘণ্টা কাজ। এত লম্বা সময় একটানা কাজ করতে গিয়ে এক-দুইবারের বেশি প্রস্রাব করারও সুযোগ পান না তাঁরা। বেশি টয়লেটে যাওয়া লাগতে পারে, এ কারণে শ্রমিকদের অল্প পানি পানের নির্দেশ জারি রাখা হয় প্রায় প্রতিটি গার্মেন্টে। একবারের বেশি টয়লেট ব্যবহারের প্রয়োজন হলেই কাজে ফাঁকি দেয়ার অজুহাত তুলতে শুরু করেন মাঝারি মানের কর্মকর্তারা (পিএম, ফ্লোর ইনচার্জ, লাইন চিফ, সুপারভাইজার)। শুরু হয় অকথ্য ভাষায় গালিগালাজ আর মৌখিক নির্যাতন। প্রয়োজনের সময় টয়লেট ব্যবহার করতে না পারায়

প্রস্রাবজনিত নানা ধরনের সমস্যায় ভুগেছেন নিজে, ভুগতে দেখেছেন সহকর্মী নারী শ্রমিকদের।

আর দীর্ঘ সময় একটানা দাঁড়িয়ে বা বসে কাজ করতে গিয়ে মাথা ব্যথা, ঘাড় ব্যথা, কাঁধে ব্যথা, মেরুদণ্ড ব্যথা, কোমরের জয়েন্টে ব্যথা, হাঁটুতে ব্যথাসহ মারাত্মক অসুস্থতায় ভুগছেন খালেদাসহ অসংখ্য গার্মেন্ট শ্রমিক। খালেদা বলেন, 'অসুস্থ হইয়া মাথা ঘুইরা পইড়া গিয়া মাথায় আঘাত পাইতে দেখছি অনেকরে। তার পরও তারা ছুটি পাইত না! আবার অসুস্থতার কারণে এক দিন অ্যাবসেন করলে তিন দিনের হাজিরা কাইটা রাখে গার্মেন্ট মালিকরা।' দুই-একটি বাদে কোন গার্মেন্টেই শ্রমিকদের কোন ওষুধ দেয় না। একবার খালেদার ডান হাতের মাঝখানের আঙুল বাটন মেশিনে কেটে যায়। প্রচুর রক্ত ঝরে। তখন তিনি বাংলামোটরে (নাদিরা) গার্মেন্টে কাজ করতেন। মালিকপক্ষ ডাক্তার দেখানো বা চিকিৎসা–কোনটারই উদ্যোগ নিত না। তিনিসহ অনেক শ্রমিক গ্যাস্ট্রিক ও শ্বাসকষ্টে ভোগেন। কাটা কাপড়, সেলাইয়ের সুতা আর মেশিনের চাকায় ঘুরতে থাকা ধুলা শ্বাস-প্রশ্বাসের সাথে পেটের ভেতরে ঢুকে অনেকের লাঞ্চে ইনফেকশন হয়ে যায়। খালেদা যে ৮-৯টি গার্মেন্টে কাজ করেছেন তার কোনটিতেই শ্রমিকরা কাজের সময় মাস্ক ব্যবহার করতেন না। তবে দুই-একটা গার্মেন্টে কাজের সময় তাঁদের সরবরাহকৃত নির্দিষ্ট পোশাক ব্যবহার করতে হত।

নারী শ্রমিকদের প্রতি যৌন সহিংসতার প্রসঙ্গ আসতেই খালেদা তাদের কারখানায় যৌন নিপীড়নের একটি ঘটনায় উৎপাদন কর্মকর্তার বিরুদ্ধে জোরালো আন্দোলনের কথা উল্লেখ করেন। "সেইটা রমজান মাসের শেষ দিকের ঘডনা–আমাদের সাথে ফিনিশিং সেকশনে কাজ করত বিউটি নামের একটা মাইয়া, দ্যাখতে হ্যারে সুন্দরীই লাগত। ঈদের ছুডিতে আমরা সবাই বাড়ি গেলাম। পিএম লিটন শিপমেন আছে, ফিনিশিংয়ের কাজ শ্যাষ হয় নাই, বায়ার আইব–এই অজুহাত দেহাইয়া বিউটিসহ আরও তিন-চারজনরে ছুডি দিল না। ঈদের ছুডির পর আমরা সবাই আইসা কাজে জয়েন করলাম, কিন্তু বিউটি আর আহে না। হাপ বেলা কাজের পর ছুডি হইয়া গেলে আমরা দুপুরেই গেলাম বিউটির বাসায়। বিউটি আমাদের দ্যাখার সাথে সাথেই কান্না জুইরা দিল। আমরা জিগাইলাম–কী অইছে, কানতেছ ক্যান? বিউটি কইল, 'পিএম লিটন আমার সর্বনাশ করছে। সবাই বাড়ি যাওয়ার পর আমাদের যে কয়জনরে ছুডি দেয় নাই তারা সবাই কাজ করতেছিলাম। পরের দিন সন্ধ্যায় ছুডি হওয়ার পর আমারে আর ছুডি দেয় না। কয়–বায়ার আসবে, তোমার সামনে মাল চেক করবে, তারপর তোমার ছুটি হবে। কয়েকটি মাল বাছাই করে আমার হাতে দিয়ে পিএম তার রুমে যাইতে বলে। তার রুমে বায়ার অপেক্ষা করছিল। পিএম আর রুমে যায় না। বায়ার মাল চেক করার নামে জোর করে আমার ইজ্জত নষ্ট করে, আমি এই মুখ দেহামু কেমনে, আমি মইরা যামু।' আমরা তখনই কারখানায় ফিরে পিএমকে খুঁজতে থাকি, কিন্তু তাকে পাই না। পরের দিন সকালেই আমরা পিএমরে ঘেরাও করে তার বিচার ও শাস্তি দাবি করি। একপর্যায়ে আমরা তাকে অনেক মারধর করি। কারখানা কর্তৃপক্ষ পিএমরে ছাঁটাই কইরা দেয়। পুলিশ তারে ধইরা নিয়া যায়। পরে কী বিচার হইছিল তা আর জানতে পারি নাই।"

> 'যেই গার্মেন্ট মালিকরা আমাদের বেতন না দিয়া পালায়, ৫ ঘণ্টা ওভারটাইম খাডাইয়া ৩ ঘণ্টার হিসাবই করে না, ওভারটাইমের মজুরি যেহানে ডাবল হওয়ার কতা, সেখানে দেয় মাত্র ৩৫% থাইকা সর্বোচ্চ ৪৫% টাকা, সেই গার্মেন্টেই আমরা কাম করি সকাল ৮টা থেকে শুরু কইরা রাত ১০-১১টা, আবার শিপমেনের (শিপমেন্ট) নামে মাঝে মাঝেই হারা রাইত।'

খাওয়াদাওয়া প্রসঙ্গে আলোচনায় খালেদা বলেন, 'শাকসবজি, ডাল আমাগো নিত্যদিনের খাবার। আমরা ডিমও খাই মাঝেমইধ্যে। সপ্তায় একবার তো খাওয়া হয়ই। মাসে দুই-তিনবার সস্তায় যেই মাছ পাই তা কিনি, ওই মাছই পাঁচ-ছয় দিন খাই। গার্মেন্ট শ্রমিকরা যেসব এলাকায় থাকে, হেইসব এলাকায় দেখবেন প্রতিদিন বিকেল ৫টা থাইকা রাইত ৯-১০টা পর্যন্ত বাজার বহে। এই বাজারে সকাল বা হারা দিনে যেইসব মাছ বিক্রি না অয় ওই মাছ পাওয়া যায়। আমরা গার্মেন্ট থাইকা বাইর হইয়া হেই মাছ কিনি। মাছগুলা নরম থাকে, দামও একটু কম থাকে। কোরবানির ঈদ ছাড়া মাংস খাইতে পারি না। তহন মানুষের অনেক মাংস থাকে, গরিবরেও দেয়। আমরা যারা কোরবানির সময় ঢাকা থাকি, তারা বাসায় বাসায় গিয়া মাংস সংগ্রহ করি।'

বকেয়া পাওনার দাবিতে সহকর্মীদের নিয়ে নিজ কারখানা, বিজিএমইএসহ কলকারখানা অধিদপ্তরে অবস্থান, ঘেরাও বা ধরনা দিয়েছেন বহুদিন। বঞ্চনা নিয়ে ফিরেছেন, মজুরি আদায় করতে পারেননি। শুরু হয় অর্ধাহার-অনাহারের জীবন। বকেয়া আদায়ের চেষ্টায় নতুন চাকরি খোঁজায় ভাটা পড়ে কিছুদিন। ১৯৯৭ সাল থেকেই খালেদা একটি গার্মেন্ট শ্রমিক সংগঠনের সক্রিয় সদস্য। একজন সংগঠক হয়েও এই বেতন আদায় করতে না পারায় খারাপ লাগতে থাকে। নতুন চাকরি খুঁজতে গিয়ে দেখেন, উল্লিখিত এলাকার কোন কারখানাই তাঁকে কাজ দিচ্ছে না। গার্মেন্ট শ্রমিকদের অধিকার আদায়ের আন্দোলনে সক্রিয় এবং সংগঠন করার কারণেই তাঁকে কাজে নেয়া যাবে না বলে স্পষ্ট জানিয়ে দেয় গার্মেন্ট কর্তৃপক্ষ। খালেদা ছিলেন উল্লিখিত অঞ্চলে খুবই পরিচিত মুখ, একটি সংগঠনের সক্রিয় সংগঠক। দুই যুগেরও বেশি সময় তিনি যে ৮-৯টি গার্মেন্টে কাজ করেছেন, দু-একটি বাদে তার প্রায় সব কটিতেই বেতন আদায় করতে হত লড়াই-আন্দোলন করেই। শুধু তিনি কাজ করেছেন ওই গার্মেন্টই নয়, পুরো মালিবাগ, রামপুরা, মগবাজার, বাংলামোটর অঞ্চলের অধিকাংশ গার্মেন্টের শ্রমিকদের বেতন আদায় করতে আন্দোলনের বিকল্প ছিল না। আর খালেদা ছিলেন এসব অধিকার আন্দোলনের মধ্যমণি। এসব এলাকার প্রায় সব গার্মেন্টের শ্রমিক থেকে মাঝারি পর্যায়ের কর্মকর্তারা তাঁকে চিনত। শ্রমিক আন্দোলন এবং তাঁর পরিচিতিই নতুন চাকরি পেতে বাধা হয়ে দাঁড়ায়। গার্মেন্ট কর্তৃপক্ষ বলে–তুমি সংগঠন করো, তাই তোমাকে চাকরিতে নেয়া যাবে না। খালেদা বলেন, 'গার্মেন্ট মালিক শালারা বানচোত, শ্রমিকগোরে ডেলি রাইত ১০-১২ডা পর্যন্ত খাডাইব, শিপমেন থাকলে হারা রাইত খাডাইব, বেতন-ওভারটাইম দিব না, আন্দোলন-সংগ্রাম করলে কইব–নেতা অইয়া গেছ? আবার চাকরিতেও নিব না।'

ক্ষোভে-কষ্টে-বঞ্চনায় আগ্রহ হারিয়ে ফেলেন গার্মেন্টের চাকরির প্রতি। যোগাযোগ বন্ধ করে দেন সংগঠন ও পরিচিত সহযোদ্ধাদের সাথে। তিন-চার মাস বেকার থাকায় হাঁপিয়ে ওঠেন খালেদা। জীবন বাঁচাতে যে কোন কাজ তাঁর করতেই হবে। শুরু করেন ছেঁড়া কাগজ আর পরিত্যক্ত প্লাস্টিক সামগ্রী টোকানো। কিন্তু টোকানো কাগজ আর প্লাস্টিক বিক্রি করে সংসার চলছিল না। কাগজ টোকাতে টোকাতেই

দেখা হয় পুরনো সহকর্মী শেফালী, শাহনাজের সাথে, তাঁরা রাস্তার পাশে ইট ভাঙছিলেন। কিন্তু পুরনো সহকর্মীদের কাছে বলতে পারছিলেন না তাঁর কষ্ট আর অভাবের কথা।

একদিকে নিজে বেকার, অপরদিকে জীবনসঙ্গী রিকশাচালক বাবু মিয়া রিকশাসহ দুই বাসের প্রতিযোগিতার চিপায় পড়ে মারাত্মক আহত হয়ে হাসপাতালে। কর্মক্ষমতা হারায় তাঁর ডান হাতটি। এসময় বিউটি আপা নামে আরেক পুরনো সহকর্মী তাঁকে ইট টোকানোর কৌশল শিখিয়ে দেন। সেই থেকে শুরু হয় ইট টোকানো এবং টোকানো ইট ভেঙে সুরকি বানিয়ে বিক্রি করার কাজ। প্রতিদিন চার-পাঁচ ঘণ্টা ইট টোকালে তিন-চার বস্তা হয়। এগুলো ভেঙে সুরকি বানালে পাঁচ-ছয় বস্তা হয়। বিক্রি করতে পারলে ২৫০ থেকে ৩০০ টাকা পাওয়া যায়। জীবনসঙ্গী বাবু মিয়া তাঁর সচল একটি হাতকে সম্বল করে এক বেলা রিকশা চালান। প্রতিদিন না পারলেও মাঝে মাঝেই বউয়ের সাথে ইট ভাঙার কাজে হাত লাগান। খালেদা বলেন, 'আমার হাসবেনের (স্বামীর) একটা ব্যাটারির রিকশা থাকলে ওর কষ্টডাও কম অইত, আবার কিছু টাকা বেশিও কামাই অইত।' বিয়ের বয়স ১৫ বছরে তাঁদের দুটি সন্তান, বড়টি ১১ বছর বয়সী ছেলে হোসেন, মাদরাসায় পড়াশোনা করে, ছোটটি মেয়ে রুমা বয়স ৫ বছর। ওরা থাকে গ্রামের বাড়ি বরিশালের উজিরপুরে নানির সাথে। প্রতি মাসেই সন্তানদের ভরণ-পোষণের জন্য টাকা পাঠাতে হয় বাড়িতে।

গার্মেন্টে চাকরিকালীন প্রায় ২৫ বছর, আর বর্তমানের ইট টোকানো ও ভাঙার দুই বছরের কাছাকাছি সময়ের তুলনা করতে গিয়ে খালেদা বলেন, 'গার্মেন্টে চাকরিকালীন সময়ে ১২-১৩ ঘণ্টা কাজ কইরা মাস শেষ অইলে বেতন পাওয়া নিয়া অধিকাংশ সময় টেনশনে থাকন লাগত। কাজের মাঝে স্টাপরা সব সময়ই ধমক-গালিগালাজ, প্রায়ই মাইরধইর করত। বেতন না পাইয়া যতবার আন্দোলন করছি ততবারই সরকার, সরকারের পুলিশ আমাগো শ্রমিকগো বিপক্ষে দাঁড়াইত। কতবার পুলিশ মারছে তার হিসাব নাই। আমরা ধরেন ৫০০ শ্রমিক বেতন না পাইয়া আন্দোলনে নামছি। পুলিশ ৫০০ শ্রমিকের না খাওয়া পরিবারের বিপক্ষে গিয়া একজন মালিকরে রক্ষা করত। আমাগো মিছিলে টিয়ারগ্যাস মারত, শ্রমিকগো নামে মামলা করত, গ্রেফতার করত। এখন ওইসবের টেনশন নাই। ইট টোকানো, ভাঙা কষ্টের কাম। কিন্তু কেউ মাইরধইর-নির্যাতন করে না। এই হিসাব করলে গার্মেন্টে চাকরি করার চাইতে এখন খারাপ নাই।

রানা প্লাজা ধসের ৬ বছর আহত শ্রমিকেরা কেমন আছেন?

২০১৩ সালের ২৪ এপ্রিল সাভারের রানা প্লাজা ধসে পড়ে। এ ঘটনায় ১ হাজার ১৩৪ জন পোশাক শ্রমিক নিহত হন। আহত হন অনেক শ্রমিক। আহত ২০০ শ্রমিকের সঙ্গে কথা বলে জরিপটি করেছে অ্যাকশনএইড বাংলাদেশ।

শারীরিক অবস্থা

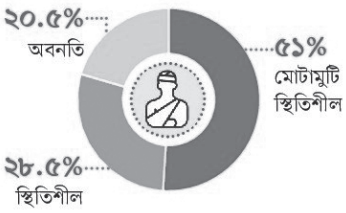

মানসিক স্বাস্থ্য

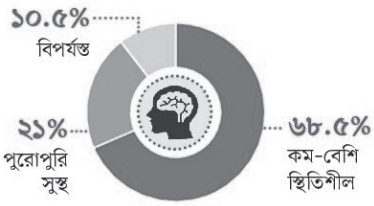

কর্মসংস্থান (শতাংশে)

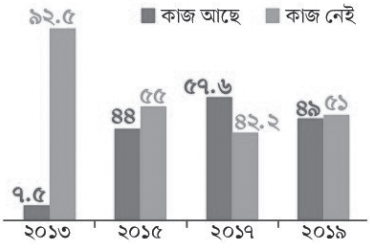

কোথায় কাজ করেন?

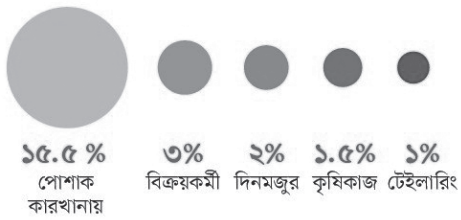

শ্রমিক পরিবারের মাসিক আয়

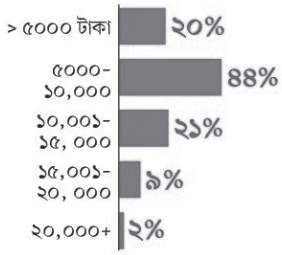

সূত্র: প্রথম আলো, ১৭ এপ্রিল ২০১৯